পূজ্যপাদ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ

স্মৃতিচারণ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

আমার যতদুর মনে পড়ে ১৯৭৬ সালের কোন সময় আমি পূজনীয় স্বামী গীতানন্দজী মহারাজকে বেলুড় মঠে মিশন হেড কোয়াটার্স অফিসের একতলায় প্রথম দেখি। ঐ অফিসে একতলায় পূর্ব-পশ্চিমে দুটি ঘর। পূর্বদিকের ঘরটিতে বসতেন পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং পূজ্যপাদ অলপী মহারাজ (স্বামী চিদাত্মানন্দজী মহারাজ)। দুজনেই সহ-সম্পাদক ছিলেন। যতদুর মনে পড়ছে, ১৯৭৬ সালে বা তার আশেপাশে পূজনীয় অলপী মহারাজের দেহান্ত হয় কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। তাঁর জায়গায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী থেকে অন্যতর সহ-সম্পাদক হয়ে বেলুড় মঠে আসেন পূজনীয় স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। ফলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভূতেশানন্দজীর সঙ্গে তিনি বসতে শুরু করেন। পূজনীয় ভূতেশানন্দজী ছিলেন খুবই শান্ত স্বভাবের। দেখলাম পূজনীয় গীতানন্দজী মহারাজও খুবই শান্ত স্বভাবের। তাঁদের দুইজনের এই সমাবেশ খুবই মাধুর্যময় ছিল। তবে ভূতেশানন্দজীকে অবশ্য মাত্র অল্পদিনই থাকতে হলো। তার কারণ তখন অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজের দেহান্তের পর যোগোদ্যান মঠের দায়িত্ব এবং সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষের পদে নিযুক্তির কারণে তাঁকে যোগোদ্যান মঠে চলে যেতে হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। তখন মঠে যাওয়া হতো সাধারণত ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জন্মতিথি, বাংলা নববর্ষ ও গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে। সেসময় পূজ্যপাদ মহারাজদের প্রণাম করতে গেলে দু-চারটা কথা হতো। আমি যখনই যেতাম গীতানন্দজী মহারাজ হেসে আমায় কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। মুখে সবসময় এক চিলতে হাসি যেন লেগেই থাকত। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার আমাকে স্পর্শ করত। যখনই মহারাজের কাছে গেছি তখনই তাঁর আন্তরিক ব্যবহার পেয়েছি। এটা শুধু আমার একারই অভিজ্ঞতা নয়, যে-ই তাঁর কাছে গিয়েছে সে-ই একইভাবে তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছে। বস্তুত, পূজ্যপাদ মহারাজের এই ব্যবহার ও আচরণ ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর সংশোধন এবং সম্পাদনার জন্য বেলুড় মঠ থেকে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল প্রতি সোমবার মঠে সেই কমিটির মিটিং থাকত। তখন আমি উদ্বোধনের সম্পাদক। মিটিং-এর পর গীতানন্দজীকে প্রণাম করতে যেতাম তাঁর ঘরে। তিনি তখন ট্রাস্টী বিল্ডিংয়ের একতলার একটি ঘরে থাকতেন। পাশের ঘরটিতে থাকতেন পূজনীয় কেশব মহারাজ। দেখতাম পূজ্যপাদ গীতানন্দজী তাঁর ঘরের মধ্যে পায়চারী করে মালায় জপ করতেন। দেখতাম তাঁর দুই হাতে দুটি মালা থাকত। একটিতে জপ করতেন এবং অন্যটিতে জপের সংখ্যার হিসেব রাখতেন। যতদিন দেখেছি ততদিনই তাঁকে জপরত অবস্থাতেই দেখতাম।

১৯৭৯-১৯৮১ সাল পর্যন্ত দুবছর যখন বেলুড় মঠ ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম তখন রাসপূর্ণিমার সময় কয়েকদিন শ্রীমন্দিরে তাঁর ভাগবত পাঠ ও আলোচনা শুনতাম। দেখতাম সাবলীলভাবে সহজ ভাষায় তিনি ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করতেন। শুনতাম ঐদিন তিনি হবিষান্ন গ্রহণ করতেন। সারাদিনে বিশেষ কথা বলতেন না। ঐ কদিন তাঁর আলোচনার পরে দোতলার প্রথম ঘরটিতে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ও ইনষ্টিটিউট অফ কালচারের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ নিত্যস্বরূপানন্দজী মহারাজকে গিয়ে আলোচনার সারাংশ শোনাতে হতো। তিনি দোতলার সিঁড়ির পাশে

প্রথম ঘরটিতে থাকতেন। গীতানন্দজীর আলোচনাতেই প্রথম শুনেছিলাম শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত। তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলাম শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্পর্কে দেশবিদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের কত নিন্দা ও সমালোচনার কথা। প্রসঙ্গত তাঁর কাছেই প্রথম শুনি রাসলীলার সময় কৃষ্ণ ছিলেন নিতান্তই বালক, শিশুই বলা যায়। তাঁর তখন বয়স মাত্রই ৭-৮ বৎসর। সে বয়সে মানুষের দেহচেতনার উন্মেষ হয় না। মহারাজ বলতেনঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিয়ে নিন্দুকেরা নিন্দার ঝড় তোলেন, বলেন এটি এক যুবকের নোংরামি। কিন্তু তাঁরা একথা বলেন না যে, ঐ বয়সটি কোন নোংরামির বয়স নয়। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিতান্তই এক শিশু। গোপীদের সম্বন্ধে ঐ শিশুর দেহচেতনার কোন বোধই থাকার কথা নয়। তাছাড়া যেসকল গোপনারী তাঁর কাছে এসেছেন ঐ সময় তারা অধিকাংশই কেউ তার মায়ের বয়সী, কেউ তার দিদির বয়সী, কেউবা তার সমবয়সী যার তখন দেহবোধের চেতনাই জাগেনি। শিশু ও বালক কৃষ্ণের আচরণে অশ্লীলতা, অসামাজিকতা, কুরুচির ভূমিকা কোথায়? রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কুরুচিকর কথা বলেছেন বিদেশের সমালোচকেরা এবং দেশীয় তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবীরা তাদের সুরে সুর মিলিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রধান অংশ গোপীলীলা। তার অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন ঃ গোপীলীলার কোন অংশে দেহের লেশমাত্র নেই। পুরোটাই এক অপার্থিব দিব্যলীলা। তিনি বলতেন যতক্ষণ তোমাদের মনে লেশমাত্র দেহচেতনা থাকবে ততক্ষণ তোমরা গোপীলীলার অর্থ বুঝতে পারবে না। গোপীলীলার মধ্যে দেহের কোন ভূমিকা নেই। তিনি এমনও বলতেন যে, যতক্ষণ তোমরা দেহচেতনার উর্দ্ধে উঠতে না পারবে ততক্ষণ 'গোপী' শব্দ উচ্চারণের অধিকারী তোমরা হতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ কৃষ্ণ এবং গোপীদের মধ্যে যে পারস্পরিক টান বা আকর্ষণ এটিকেই দেখ, এর মধ্যে অন্য কিছু খুঁজতে যেওনা। এ হলো ভগবান ও ভক্তের অপার্থিব সম্পর্ক। তোমরা এর মধ্যে দেহকে এনো না। শুধু ঐ দুর্নিবার টানটিকেই নাও। এই টান ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে চিরন্তন আকর্ষণের লীলাবিলাস। আমরা অনেকেই ভুলে যাই, রাধা এবং কৃষ্ণের দিব্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে গেলেন তখন রাধার বয়স প্রায় ১৫ বৎসর আর কৃষ্ণের ১০ বছর আট মাস।

দেখতাম পূজনীয় নিত্যস্বরূপানন্দজী মহারাজ খুব একাগ্রচিত্তে তার অনেক বছরের কমবয়সী গীতানন্দজী মহারাজের আলোচনার সারসংক্ষেপ শুনতেন। তা দেখে আমার তাঁর সম্পর্কে মনে হয়েছিল যে তাঁর ছিল যথার্থই বিদ্যানুরাগ এবং গুণগ্রাহিতা। গীতানন্দজী মহারাজকে যতই দেখতাম ততই তাঁর সরলতা, নিরভিমানতা, গুণগ্রাহিতা এবং আধ্যাত্মিক ভাব আমার কাছে ক্রমেই ফুটে উঠত। তিনি ছিলেন খুব শান্ত স্বভাবের এবং অদোষদর্শী। বড়-ছোট সকলের সঙ্গে তার ব্যবহারের কোন তারতম্য দেখতাম না। জপের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাকে দেখে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট করার আকাঙ্খা জেগে উঠত। তাঁর ভাগবতের আলোচনা সাধু ও ব্রহ্মচারীদের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হতো। সহজ সরল ভাষায় ও ভাবে তিনি বিষয়কে প্রাঞ্জল করে তুলতেন। আমার মনে আছে ট্রেনিং সেন্টারে তিনি একবার ভগবান বুদ্ধ প্রসঙ্গে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণের মধ্যে দার্শনিক বিষয়কে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনে তাঁর পারঙ্গমতা দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। বৌদ্ধদর্শন খুবই জটিল একটি বিষয়। বিশেষ করে নাগার্জুনের দর্শনভাবনা বোঝা খুব দুরূহ। কিন্তু দেখতাম নাগার্জুনের দর্শন ভাবনা সাবলীলায় তিনি বেদান্তের সঙ্গে সমন্বিত করে এবং কোথায় কোথায় বেদান্ত থেকে তা আলাদা তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। মনে হতো, কৃষ্ণজীবন এবং ভাগবত তার বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁর পায়ে, দুই হাঁটুতে আর্থারাইটিসের সমস্যা ছিল ফলে ফলে হাঁটা চলায় বিশেষ অসুবিধা বোধ করতেন। হয়ত সে জন্যই ট্রাস্টি বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলা থেকে তিনি একতলায় থাকতে শুরু করেছিলেন।

যখন তিনি সহাধ্যক্ষ পদে বৃত হলেন তখন আমাদের অনেকেরই চিন্তা হতো তিনি কেমন করে দীক্ষাদির জন্য বাইরে যাতায়াত করবেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম সহাধ্যক্ষ হওয়ার পর থেকেই তিনি যেন যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেতে শুরু করলেন। আমি তখন ত্রিপুরায়। তিনি কিছুদিনের জন্য ধর্মনগর, কৈলাসহর, কুমারঘাট এবং আগরতলার আশ্রমগুলিতে দীক্ষা প্রদানের জন্য আগমন করেন। পুরো সময়টাই আমি তাঁর সঙ্গে থেকেছি। দেখতাম ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতি কেউ শ্রদ্ধাশীল হলেই তিনি তাকে দীক্ষা দিতেন। রাত্রে খাওয়ার পর প্রতিদিন তাঁর ঘরে কথামৃত পাঠ হতো। পাঠ করতেন তাঁর সচিব মহারাজ। পাঠের আগে তাঁর নির্দেশক্রমে সচিব মহারাজ ঠাকুরের একটি প্রার্থনা পাঠ করতেন। সেটি ছিল কথামৃতের ১৮৮৫, ১১ মার্চের দিনলিপি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে। যেখানে ঠাকুর জগজ্জননীর কাছে ব্যাকুলভাবে ভক্তি প্রার্থনা করছেনঃ

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা যে যে-আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, সকলে উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখনও শুনেন নাই-যেন শুধাবর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা বলে ডাকা, তাঁরা কখনও শুনেন নাই, দেখেন নাই। আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখিবার কি প্রয়োজন? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহমধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দর রূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে। অবতার হউন, আর নাই হউন, ইঁহারই চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার জো নাই! ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ ওইরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখবিগলিত হরিনাম, আর মায়ের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। নামগুনকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেণ, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, "মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত! দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না,(অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়--- নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই--- তোমার মায়ার সংসারে, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনও না হয়! মা! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন---কৃপাকরে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।"

পূজ্যপাদ স্বামী অক্ষরানন্দজী মহারাজের শিষ্যের কাছে শুনেছি যে, দীক্ষার আগে তিনিও কথামৃতের এই অংশটি পাঠ করতেন। পূজ্যপাদ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজেরও গুরু ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ। অক্ষরানন্দজীর তাই। আমার মনে হয়, কথামৃতের এই অংশটি পূজনীয় গীতানন্দজী ও অক্ষরানন্দজী মহারাজের এত প্রিয় হওয়ার কারণ, তাঁদের উভয়েরই গুরু বিরজানন্দজী মহারাজ যাঁর কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রিয় প্রার্থনাটির কথা তাঁরা জেনেছিলেন এবং সেটিকে জীবনে এক মহামন্ত্ররূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

পূজ্যপাদ গীতানন্দজী মহারাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতাম। ওঁর রুটিন ছিল নিখুঁত। ভোরে মঙ্গল আরতি থেকে শুরু করে তাঁর প্রতিটি কাজ নিবিড় ছন্দের মধ্যে বাঁধা থাকত। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে ছিল একটি অনবদ্য শৃঙ্খলা যাকে ঘিরে থাকত তাঁর জপের প্রতি পরম নিষ্ঠা। আমরা হয়ত তাঁর মতো এত জপ করতে পারি

না অথবা ঐরকম জপের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের জীবনে আনতে পারি না। কিন্তু মহারাজকে যেভাবে সর্বক্ষণ জপরত অবস্থায় দেখতাম তা আমাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করত। আর্থারাইটিসের জন্য ওঁর বসার অসুবিধা হতো বলে তিনি পায়চারি করতে করতে জপ করতেন দেখতাম। ভাবটা ছিল এইরকম যে জীবনের কোন মুহূর্ত যেন অপব্যয়িত না হয়, প্রতিটি মুহূর্তের যেন সদ্ব্যবহার হয়। তাঁর কাছে 'সদ্ব্যবহার' মানে জপ করা। জপ ছাড়া তিনি কখনো থাকতেন না। তার জীবন থেকে এই শিক্ষাটি পেয়েছি যে প্রতিটি মুহূর্তে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সময়ের পূর্ণ সৎ ব্যবহার করতে হবে। তাঁর কাছে জপের অর্থ হচ্ছে নিজেকে জপের মধ্যে সর্বক্ষণ যুক্ত রাখা।

আমরা বলেছি রাসপূর্ণিমার সময় তিনি কয়েকদিন আহার সংযম ও বাকসংযমের মধ্যে নিজেকে নিরত রাখতেন। শুনেছি ঐ সময়ে তিনি কখনো কখনো বৃন্দাবন বাস করতেন। বৃন্দাবন ছিল তাঁর খুব প্রিয় জায়গা। ধর্মনগর ও কৈলাসহর দীক্ষা শেষ হলে তাঁকে আগরতলা আশ্রমে নিয়ে আসি। গান্ধীইল রোড ও ধলেশ্বর উপকেন্দ্রে দুইদিন ভক্তদের দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অগণিত ভক্ত আসেন তাঁকে দর্শন করতে। প্রধানকেন্দ্র বিবেকনগরে রোজ ভক্তরা আসতেন তাঁকে দর্শন করতে। দীক্ষা হতো বিবেকনগর আশ্রমে। দীক্ষা না থাকলে বিবেকনগরে সকালে একবার দর্শন হতো সকাল ১০:০০মি.-১০:৪৫মি. এবং বিকেলে ৫:০০মি. থেকে সন্ধ্যা আরতির পূর্ব পর্যন্ত। ঐসময় ভক্তদের কোন প্রশ্ন থাকলে তিনি হাসিমুখে উত্তর দিতেন। তাঁর অনাড়ম্বর কথাবার্তা এবং জীবন ভক্তদের খুবই স্পর্শ করত। দীক্ষা অবশ্য বিবেকনগরেই হতো। যতদুর মনে পড়ছে এক সপ্তাহ বা তার বেশী তিনি দীক্ষা প্রদান করেছিলেন। বিবেকনগরে থাকার সময় একদিন ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দীক্ষার নির্ঘন্ট পূর্বঘোষিত থাকায় আমরা সেই নির্ঘন্ট স্থগিত বা পরিবর্তন করতে পারিনি। সেদিন বেশকিছু ভক্ত ছিলেন যারা বন্ধের মধ্যে কিভাবে আসবেন দুর-দুরান্ত থেকে তা ভেবে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। মহারাজকে সেকথা জানাতে তিনি বললেন ঃ যারা স্থানীয় ভক্ত যদি তাঁরা আসতে পারে তো আসুক। আমি দীক্ষা অন্যদিনের থেকে একটু দেরীতে শুরু করব। আর যদি এমন হয় যে, দীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, নাটমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ তারপরও এক বা একাধিক দীক্ষার্থী এসে পৌঁছেছে, কোন দ্বিধা না করে দীক্ষার স্থানে তাদের নিয়ে আসবে। বস্তুত, সেদিন বেশকিছু ভক্ত দেরিতে এসে পৌঁছেছিলেন। মহারাজ তাঁদের প্রত্যেককে কৃপা করেছিলেন, কাউকেই ফিরিয়ে দেন নি।

কুমারঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত একটি প্রতিষ্ঠান(মঠ-মিশনের অন্তর্ভূক্ত কোন প্রতিষ্ঠান নয়) প্রচার করছিল যে তাদের প্রতিষ্ঠান বেলুড় মঠেরই শাখা। তাদের এখানে দীক্ষা নিলে তা বেলুড় মঠেরই দীক্ষা নেওয়া হবে। সাধারণ ভক্তরা অতশত বোঝেন না তাঁরা অনেকেই সেখানে দীক্ষার জন্য নাম লেখান। আমাদের কিছু ভক্ত এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এই সময়ে কুমারঘাটে পূজ্যপাদ গীতানন্দজী মহারাজের আগমন হয়। মহারাজের অনুমোদনক্রমে কুমারঘাট আশ্রমে মহারাজের তিনদিন দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তিনদিনে প্রায় ছয়শত ভক্তের দীক্ষা হয়। এতে একটা জিনিস ঘটল, ঐ প্রতিষ্ঠানটি যে বেলুড় মঠের অন্তর্ভূক্ত নয় সেটি আর বলার বা ব্যাখার অপেক্ষা থাকল না। যারা ঐখানে বেলুড় মঠের দীক্ষা বলে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল তাদের একটি বড় অংশ পূজনীয় মহারাজের কাছে পুনরায় দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে পুনরায় দীক্ষার জন্য আবেদন করল। কারণ, তাদের বোঝানো হয়েছিল, সেখানে দীক্ষা নিলে সে দীক্ষা বেলুড় মঠেরই দীক্ষা হবে। আমাদের আর কিছু বলতে হলো না। এর ফলে ঐ অঞ্চলে এই ব্যাপারে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তা এমনই দুর হয়ে যায়। পূজ্যপাদ মহারাজের আগমনে এই একটি বড় কাজ হয়ে গেছিল। কৈলাসহরে থাকার সময় মহারাজ একদিন ঊনকোটি দর্শনে যান। সেখানে প্রায় হাজার বছর বা তার

আগের পাহাড়ের গায়ে কিছু মুর্তি খোদাই করা আছে। স্থানীয় ভক্তরা বলেন ওখানে এক কম এক কোটি দেবদেবীর মূর্তি আছে। এক কম এক কোটি অর্থাৎ 'ঊনকোটি'। ঊনকোটি পাহাড়টি শৈবতীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। ওখানে পাহাড়ের খাদে কিছুটা কিছুটা নীচে নামতে হয়। অসুবিধা সত্ত্বেও মহারাজ অনেকটা নীচে নেমে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করেছিলেন এবং খুব আনন্দ লাভ করেছিলেন। সেদিন রাতে খাওয়ার পর নাইট ক্লাসে মহারাজ আমাদের বললেনঃ ঊনকোটি কৈলাসহরের কাছে। আমার মনে হয়, ঊনকোটির সঙ্গে কৈলাসহরের নামের একটি সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার ধারণা, কৈলাসে যে 'হর' অর্থাৎ শিব আছেন তিনিই ঊনকোটির প্রধান দেবতা। কৈলাস থেকে 'হর' অর্থাৎ শিবকে যেন এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

পূজনীয় মহারাজের কাছে একটি নতুন ঘটনা শুনেছিলাম স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ সম্বন্ধে। কথাটি সামান্য উল্লেখ পাই মায়ের সঙ্গিনী যোগীন মা'র একটি উক্তিতে। মহারাজ ঘটনাটি শুনেছিলেন তাঁর গুরু পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মুখে। ঘটনাটি হলো--মহারাজ বলেছিলেন--শিকাগো ধর্মমহাসভার মঞ্চে যখন স্বামীজী পৌছলেন তখন কলম্বাস হলে কানায়-কানায় ভিড়। হল একবারে উপচে পড়ছে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহু মানুষ ঘরে এবং ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই মানুষের ভিড়, বলাবাহুল্য প্রধানত শ্বেতাঙ্গ নরনারীর ভিড়। এমন অগণিত জনসমাবেশ স্বামীজী জীবনে প্রথম দেখলেন। স্বভাবতই স্বামীজীর মনে একটা ভয় এসে জাগল। পরে যখন স্বামীজীর নাম ধরে তাঁকে পোডিয়ামে আহ্বান করা হলো তখন স্বামীজী এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে, তিনি বললেন যে তিনি পরে বলবেন। এইরকম দুই-তিনবার হয়েছিল। এরপর যখন শেষবারের মতো তাঁর নাম ধরে আহ্বান করা হলো তখন তিনি আবার বললেন, তিনি পরে বলবেন। অগত্যা সভার প্রেসিডেন্ট তাঁর নাম ঘোষণা করে দিলেন ঃ "ভারত থেকে আগত পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ এবার তাঁর ভাষণ দেবেন।" বাধ্য হয়ে স্বামীজী পোডিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখে পড়ল কলম্বাস হলের প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পায়ে হেঁটে নয়, সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে। তাঁর ডান হাতে ধরা একটি ত্রিশূল। সেই ত্রিশূলটি নিয়ে তিনি সামনে-পিছনে নিক্ষেপ করার ভঙ্গিতে দোলাচ্ছেন। প্রতিবার এই ভঙ্গিতে ত্রিশুল থেকে বিদ্যুতের ঝলসানোর মতো তীব্র জ্যোতিঃশিখা উদগীরিত হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎশিখা পুরো কলম্বাস হলকে ছেয়ে ফেলছে। স্বামীজী দেখলেন ঐ ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এগিয়ে আসছেন মঞ্চের দিকে। অবশেষে তিনি এসে স্বামীজীর শরীরে মিশে গেলেন।

এই ঘটনা শুধু স্বামীজীই দেখলেন। কলম্বাস হলের আর কারো চোখে পড়ল না । মহারাজ যখন ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহারাজের প্রিয় বন্ধু সঙ্ঘের আরেক প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী মহানন্দ মহারাজ (শীতাংশু মহারাজ)।

একদিন গীতানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করলেন। অবশ্য মন্তব্যটি অনেক আগে পরম পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজী মহারাজের মুখেও শুনেছিলাম।'দেবলোকের কথা' গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখিত রয়েছে। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন দক্ষিনেশ্বরে গিয়েছেন। গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তাঁকে দেখতে পেলেন না। তাই কালীমন্দিরের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, ঠাকুর মন্দিরে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে মাকে মুখখিস্তি করে যা নয় তা-ই বলছেন। গিরিশবাবু অবাক হয়ে দেখছেন আর ভাবছেন, এ কী ভাষায় ঠাকুর মাকে গালাগালি করছেন। এমন সে ভাষা যে গিরিশবাবুর মতো মানুষ কানে আঙ্গুল দিলেন। কিন্তু সেখান থেকে নড়তে পারলেন না। দেখলেন মাতা ও পুত্রের মধ্যে কী অসাধারণ এক অপূর্ব দিব্য সম্পর্ক। হঠাৎ পিছন ফিরলেন ঠাকুর।

পিছন ফিরেই দেখলেন গিরিশকে। দেখে কিছুটা অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বললেনঃ “মাইরি বলছি, কিন্তু কোন সংস্কার নেই।” গিরিশবাবু ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গদগদ করে বললেনঃ “ঠাকুর, খিস্তি-খেউড়েও তুমি আমার গুরু!”